কারমাইকেল শতবর্ষ;###;শরীফা খন্দকার

সাদা-কালো দিনগুলো এবং ঢাকার মেয়র আনিসের কথা

প্রকাশিত : ০৪ :৩১, ২৪ মে ২০১৫

সাদা-কালো দিনগুলো এবং ঢাকার মেয়র আনিসের কথা

মূল গেট পেরিয়েই পেয়েছিলাম একটা ছন্দময় পথ, যার দু'পাশ দিয়ে দাঁড়ানো সারি সারি সবুজ দেবদারু। অদূরেই টেনিস কোর্টের জাল ঘেঁষে মহীরুহসম রোদমাখা কিছু ইউক্যালিপ্টাস। আমার মুগ্ধ চোখ দেখেছিল শ্বেতমর্মরে গাঁথা এক বিশাল রাজপ্রাসাদ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাদের পাতার ফাঁক দিয়ে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈলী, মোগল স্থাপত্যকলার সংমিশ্রণে অপূর্ব কারুকার্যময় কারমাইকেল কলেজকে কাছে থেকে দেখার সেটাই আমার প্রথম দিন। প্রাঙ্গণের শত শত ছাত্র-ছাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে বিস্ময় আনন্দে ভেবেছিলাম- 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি যেথা করিছে কোলাকুলি!' ব্রিটিশ বাংলায় সাড়ে নয় শ' বিঘা জমির ওপর রংপুর কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেবল দৃষ্টিনন্দন হিসেবে নয়, এক সময় এই ঐতিহ্যম-িত বিদ্যাপীঠের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বহুদূরব্যাপী। এমন সুবিশাল, দর্শনীয় এবং খ্যাতনামা কলেজ ব্রিটিশ বাংলায় ছিল আঙ্গুলে গোনা। কারমাইকেলের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ দীর্ঘ সময় ধরে দেশ ও সমাজে রেখে গেছেন যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় অবদান। রেবতী মোহন দত্ত চৌধুরী (অসম সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক), শহীদ জননী জাহানারা ইমাম অধ্যয়ন করেছিলেন এই কলেজেই। পরবর্তীতে ছাত্র ছিলেন আসাদুজ্জামান নূর এবং আরও অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। কারমাইকেলে আমার উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হওয়ার পর তদানীন্তন পূর্ববাংলার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘনঘটায় হয়ে উঠেছিল উত্তাল। এই সময়টাতে কারমাইকেলে কলেজ ছাত্রসমাজের গৌরবময় ভূমিকা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী। স্বাধীনতার আন্দোলন ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নেতৃত্ব দিতে তারা রেখেছিল অগ্রণী ভূমিকা। আমার কলেজজীবনের সাদা-কালো দিনগুলোয় বিদ্যা অর্জনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল চেনা-অচেনা নানা দুর্লভ বৃক্ষ ও পুষ্পে-লতায়। আমি কারমাইকেল প্রাঙ্গণেই দেখেছি গানের শিরীষ শাখা- রাধাচূড়া নামের ফুল। ক'মাস আগে জনকণ্ঠের রিপোর্টে পড়লাম কারমাইকেল ক্যাম্পাসে এখনও দূর অতীতের স্মৃতি নিয়ে মাথা দোলায় অতি দুর্লভ কাইজ্যালিয়া বৃক্ষ। ১৯১৫ সালে কারমাইকেল কলেজের ভবনগুলোর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল। তদানীন্তন বাংলার বড়লাট লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ সালে উদ্বোধন করেন নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত সেই কলেজ। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর কারমাইকেল কলেজ হলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। আজ আমার বিদ্যানিকেতন শতবর্ষের মুখোমুখি। আর এই মুখোমুখি দিনে সহপাঠী আনিসুল হক সম্প্রতি নির্বাচিত হয়ে গেল রাজধানী ঢাকা উত্তরের মেয়র হিসেবে। ভর্তি হওয়ার পর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আমাদের একজন ইংরেজীর শিক্ষক শামসুল হক কৌতুকের সুরে জানিয়েছিলেন-

কারমাইকেল কলেজ মূলত দাঁড়িয়ে আছে বড় একটি শূন্যের ওপর। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত স্যার নতুনদের সঙ্গে মজা করছেন। কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে এক অসামান্য গল্পের মাধ্যমে জানলাম- কৌতুক নয়, ব্যাপারটা সত্যই বটে। কলেজ প্রতিষ্ঠায় সিংহভাগ অনুদানের শপথ ছিল রংপুরের অন্যতম বিখ্যাত জমিদার তাজহাটের মহারাজা গোবিন্দ লাল রায় বাহাদুরের। তিনি শহরের প্রান্তসীমায় কলেজের জন্য ভূমি এবং নগদ দশ হাজার টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। ভূমি হস্তান্তরের পর একদিন যথারীতি গোবিন্দ লাল তার সরকারকে সামনে বসিয়ে নির্দেশ দিলেন কলেজের জন্য দশ হাজার টাকার একটি দানপত্র রচনা করার। কিন্তু দলিল লিখতে গিয়ে ঘটে গেল একটি অভাবনীয় কা-। সরকারবাবু ভুলক্রমে দিয়ে ফেললেন অতিরিক্ত আরেকটি শূন্য। তাতে করে টাকার অঙ্কটা হয়ে গেল এক লাখ! কিন্তু লজ্জিত সরকার মশাইয়ের নতুন দানপত্র তৈরিতে বাধা দিলেন গোবিন্দ লাল- শোনো সরকার ভুল যখন হয়েই গেল তখন এই দানপত্রটিই থাক। পাঞ্জাব থেকে আগত তাজহাট মহারাজার প্রথম পুরুষ ছিলেন রতœ ব্যবসায়ী। এই অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে ব্যবসা করে বিশাল বিত্তবৈভবের অধিকারী হয়েছিলেন তারা। কিন্তু মহারাজা গোবিন্দ লাল রায় সম্রাট শাহ্জাহানের মতোই জানতেন, ‘কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।’ কিন্তু একটি বিদ্যাপীঠ তাজমহলের মতো অক্ষয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। আজ রংপুর তাজহাটে শূন্য রাজবাড়িটাই কেবল পড়ে আছে জাদুঘর হয়ে। রাজা রানী রাজপুত্র কেউ সেখানে নেই, তাদের বিত্ত-সম্পদও কিছু নেই। কিন্তু মহারাজার সেই একদা শূন্যের মহিমায় একশত বছর ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড়লাট লর্ড কারমাইকেলের নামে প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যাস্থান। রংপুরের অন্য জমিদারবর্গসহ অর্থবান ব্যক্তিরাও কলেজের জন্য দিয়েছিলেন সাধ্যমতো অনুদান। আমরা ষাট দশকের শেষদিকে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়া মেয়ের দল খুব আমোদ পেতাম অফ পিরিয়ডগুলোতে কমন রুমের পেছনের চোরকাঁটা ভরা মাঠ পেরিয়ে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়ির সামনে ফুলে ফুলে ভরা নির্জন পথটা দিয়ে ছুটে বেড়াতে। বালিকা বিদ্যালয়ের পাঁচিলঘেরা দিন ফুরিয়ে উপভোগ করতাম মুক্তির আনন্দ। ওখানে কোন গাছ থেকে সম্ভবত বারো মাসই ঝরে পড়ত বকুল ফুল। এটা যেন ছিল ‘তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে’। আমার শৈশবে নানা গাইতেন শচীন কর্তার এই গান। ওপথে শুধু বকুল নয় আরও ঝরে থাকত স্বর্ণচাঁপা, কাঁঠালিচাঁপারা। সেদিন আমরা ওড়নার আঁচলে কুড়িয়ে নিতাম নরম বকুল ও কাঁঠাল রঙের সুগন্ধি ফুল। এখন কেমন বানানো গল্পের মতো শোনায়! একটু পুরনো হলে যখন কোন কারণে ক্লাস সাসপেন্ড হতো তখন মেয়েরা সদলবলে চলে যেতাম আরও দূরে। লন্ডনের মতো লাল রঙে রাঙানো জি এল হোস্টেল ছাড়িয়ে বহুদূরের এক গ্রামে। বিকেল পাঁচটার আগে আমাদের কলেজ বাস ছাড়ত না যে! ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে আমরা আসা-যাওয়া করতাম একটি পুরনো সবুজ বাসে করে। সিনিয়র মেয়েদের মধ্যে রক্ষণশীল দু-একজন খুবই অপছন্দ করত এমন নির্মল আনন্দের ব্যাপারটি। একদিন শাসনের সুরে এক আপা বললেন, ‘কলেজে ভর্তি হয়ে তো দেখি তোমাদের দুটো করে ডানা গজিয়েছে। শুনে রাখ, এক সময় এই কলেজের মেয়েরা একা একা ক্লাসে পর্যন্ত যেত না। স্যাররা ক্লাস নেয়ার আগে কমন রুমের সামনে এসে অপেক্ষা করতেন এবং ছাত্রীরা তাদের পেছনে পেছনে যেত শ্রেণীকক্ষে।’ যখন খুব ছোট ছিলাম দেখতাম কলেজের বাস এসে দাঁড়াত বাড়ির সামনের রাস্তায়। পড়শী পাপড়ি আপা, রুবি আপা দু’বোন নতমুখে বই-খাতা বুকে করে কলেজের বাসে উঠতেন। অথচ তাদের বাড়ির গ্রামোফোনেই বাজত মান্নাদের গান- ‘ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে কতই খেলা’... তাদের পরনে থাকত চিকন পাড় সাদা শাড়ি আর সে পাড়ের নামই নাকি ছিল কলেজ পাড়। কিন্তু আমাদের সিনিয়র মেয়েরা রং-বেরঙের শাড়িতে হয়ে

উঠেছিল বর্ণিল প্রজাপতি। (চলবে)